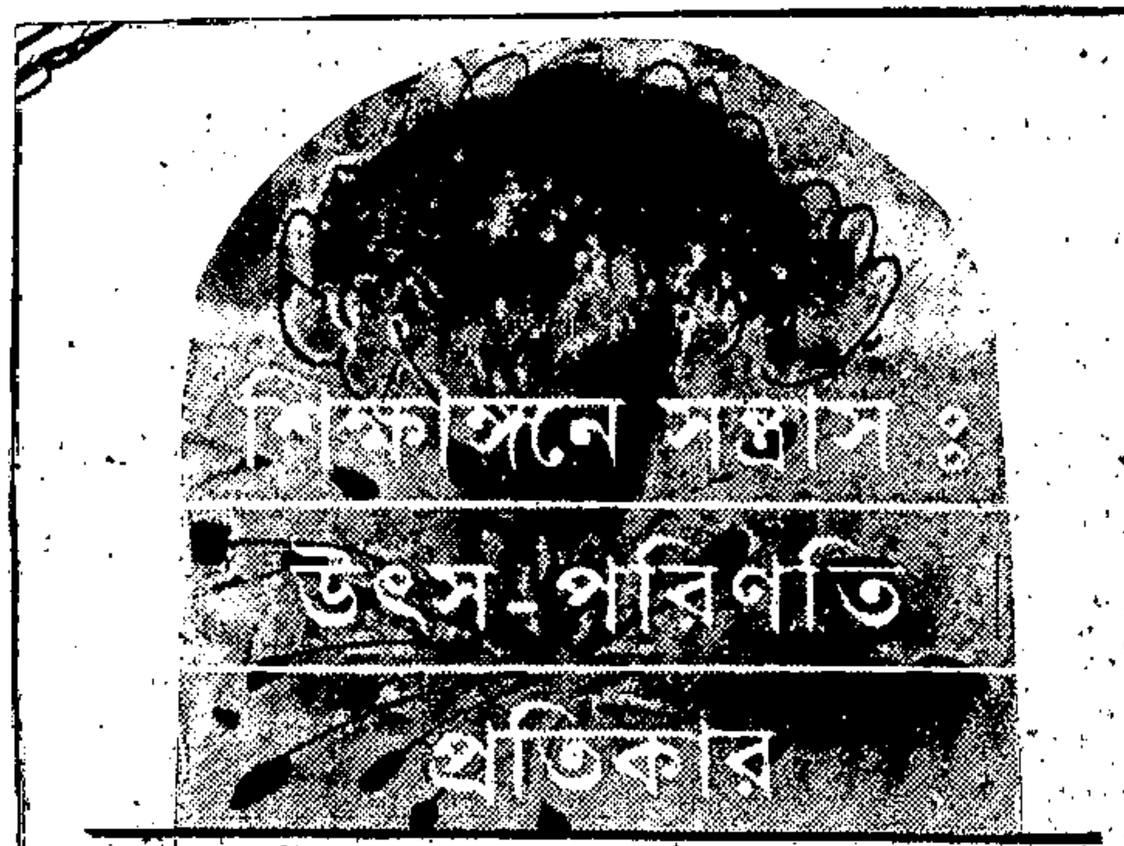

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস : উৎস-পরিণতি প্রতিকার

সৈয়দ কামরুল আহ্সান

পূর্ব প্রকাশের পর

নিরু-অভি'র মাধ্যমে তার সর্বশেষ সৃষ্ট সন্ত্রাস হিসেবে আজো সচেতন মানুষের মনে স্মরণযোগ্য। একদা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের শীর্ষ স্থানীয় এই দুই সাহসী তরুণ প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠক ছিলেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বর্তমান উত্থান ও অবস্থান তৈরির পেছনে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

এখানে একটা কথা বলা দরকার বলে মনে করি, নিরু-অভি'র মত এই দুই তারুণ্যদীপ্ত যুবক পর্যায়ক্রমিকভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছেন কিন্তু এটা সত্য যে, তারা যখন ঢাকা কলেজে পড়তে আসেন তখন কেউই সন্ত্রাসী ছিলেন না। রাজনীতিক নষ্ট প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমিকভাবে এরা ছাড়াও বহু তরুণ পরবর্তীকালে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

তারুণ্যের উজ্জ্বল দিনগুলো কেন তারা এভাবে ব্যয় করলেন তা প্রকাশিত হওয়া দরকার। কেননা সন্ত্রাসী কর্মে যারা নানাভাবে জড়িয়েছেন তাদেরও একদিন স্বাভাবিক জীবন-যাপন ছিলো।

সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত প্রতিটি ছাত্রদের কিংবা ছাত্রনামধারী ব্যক্তিরা কিভাবে একে একে সন্ত্রাসী হয়ে উঠলেন তা প্রকাশিত হলে এটা স্বীকার্য যে ছাত্রদেরকে স্বাভাবিক জীবনে অবস্থান করতে উৎসাহিত করাই হবে। কোন তারুণ্য প্রকৃত অর্থে আর নষ্ট প্রজন্ম হিসেবে জন্ম নেবে না।

আমার জানা মতে জাতীয়তাবাদী দলের কোন কোন সিদ্ধান্ত ও ভূমিকার প্রতি সমালোচনা করার কারণে নিরু-অভি দু'জনেই নিজ সংগঠনেই কোণঠাসা হয়ে পড়েন ও নিজেরাই দলের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে সমালোচিত অবস্থায় উপনীত হন।

এবং নিজ দল কর্তৃক বহিষ্কৃত হন, পরবর্তীতে সন্ত্রাসে নিজেদেরকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ফেলার কারণে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কোন পথ না পাওয়ায় এরশাদীয় সন্ত্রাসে নিজেদের যুক্ত করেন, স্বৈরাচারী এরশাদ এভাবে তাদেরকে সুযোগ-এর ভিত্তিতে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। এটা প্রমাণিত সত্য যে, যারা সন্ত্রাসকে নিজের চরিত্রের একটি অংশ হিসেবে প্রয়োগ করতে চান পরবর্তীতে নানাবিধ কারণে সেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডই তাদের জীবনের স্বাভাবিকতা কেড়ে নেয়।

সন্ত্রাসী বিপথগামী তরুণরা এভাবে এক ছত্রচ্ছায়া থেকে অন্য ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সন্ত্রাস চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ না থাকায় ক্রমশ হতাশা তারুণ্যকে গ্রাস করছে এবং পথহারা তারুণ্য মনে হচ্ছে প্রাণহানির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হচ্ছে এবং মৃত্যু ছাড়া সন্ত্রাসী পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এটা প্রত্যাশিত নয় যে, তারুণ্য ভুল পথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলুক এবং মৃত্যু দিয়েই তার জীবন পরিণতি নিঃশেষিত হোক।

আমাদের পূর্ব প্রজন্মের যারা এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন তাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে- ১৯৭৫ পূর্ব বর্তমান জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির প্রধান ও তৎকালীন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি শফিউল আলম প্রধান-এর নেতৃত্বে ছাত্র রাজনীতির জঘন্য হত্যাকান্ড যা 'স্যাডেন মার্ডার' নামে আজো পরিচিত।

মহসীন হলে এই হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছিলো। এটা ইতিহাস থেকে প্রত্যক্ষ করছি এই সকল হত্যাকান্ড রাজনীতির আড়ালে ব্যক্তিনির্ভর গ্রুপভিত্তিক আত্মকলহের স্বরূপ ছাড়া কিছু নয়। ইতিহাস আরো প্রমাণ করে যে, যারা এই হত্যার পেছনে ছিলেন তাদের পরিচয় ছাত্র-সমাজ ও দেশের নাগরিক আজ অবধি জানতে পারেননি। যাদের অদৃশ্য আড়াল ইঙ্গিতে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় তারা সকল সময় বর্ণচোরা চেহারায়ই থেকে যান। তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সরকার প্রধান থাকা অবস্থায় সরকারী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত এই শফিউল আলম প্রধানসহ অন্যদের পরবর্তীতে প্রশ্রয় দেননি। সরকারী ছাত্র সংগঠক হওয়া সত্ত্বেও শফিউল আলম প্রধানসহ অন্যরা আইনের উর্ধ্বে যেতে পারেননি। তার বিরুদ্ধে আনীত হত্যা মামলায় তিনি সহ কয়েকজন ছাত্র সংগঠক সন্ত্রাসী কারণে কারাবরণ করেছিলেন এবং হত্যার অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে পরবর্তীতে তারা বিএনপি প্রধান মরহুম জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকার কর্তৃক কারামুক্ত হন। এ দৃষ্টান্ত পরবর্তী ধারায় বহুবার ঘটতে দেখেছি। এক সরকার কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলেও ভিন্ন সরকারের শাসনামলে সন্ত্রাসী চরিত্রের ব্যক্তিরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পুনর্বাসিত হয়েছেন। এটা অবশ্যই লক্ষণীয় যে আশ্রয় প্রদানকারী সরকারের, রাজনীতিতে যোগদানে শর্তসাপেক্ষ এরা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে সেই দলের বা এজেন্সীর পক্ষে যে কোন ধরনের অপকর্ম করতে বাধ্য হন। সন্ত্রাসী আচরণ পরিহার করে যদি প্রতিটি সরকার ও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ সত্যবদ্ধতায় নিজেরাই সচেতন না হন তবে এই রকম হত্যানির্ভর সন্ত্রাস কখনই দেশের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দূর করা সম্ভব হবে না।

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রচুর বে-আইনী অস্ত্র থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে সমগ্র দেশব্যাপী সন্ত্রাস ব্যাপকতা লাভ করে। কেননা সরকারী বিরোধী উভয়ের কাছে অস্ত্র ছিলো। তদানিন্তন সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অস্ত্র জমাদানের ঘোষণা দেয়া হলেও উভয়পক্ষ থেকে প্রহসনমূলক অস্ত্র জমাদান নাটক প্রদর্শিত হতে নামমাত্র দেখেছি। এই অস্ত্র জমাদান সন্ত্রাসের সমাপ্তি ঘটাতে পারেনি। তারুণ্যের স্বভাবসুলভ হিরোইজম, রোমান্টিসিজমকে কেন্দ্র করে সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠনগুলো নিজস্ব ক্ষমতা দখলের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তারে অপব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এটা দুঃখজনক সত্য যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে কিংবা ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময়কালে নতুন স্টাইলে সন্ত্রাস সংঘটিত হতে থাকে। ১৯৭৫ পরবর্তী বর্তমান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও ১৯৭১ সালের সেক্টর কমান্ডার মরহুম জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ও উল্লেখ্য ভূমিকা রাখলেও পরবর্তী সময়ে জামাত-শিবির রাজাকারদের পুনর্বাসন ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। জামাত-শিবির দেশদ্রোহী চক্র আজ দেশের অভ্যন্তরে ধর্মকে আশ্রয় করে ভিন্ন আচরণের নায়কীয় হত্যাযজ্ঞ সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। দেশ ও বিদেশের চাপে তিনি নানাভাবে এই সকল সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা কার্যত না নিয়ে বরং এক ধরনের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। এক সরকার প্রধান দ্বারা সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্তরা পরবর্তীতে অন্য সরকার দ্বারা আরো বেশি উপকৃত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত ধারায় উঠে এসেছে যার ফলাফল রাজনৈতিকভাবে দেশ ও জনগণের জন্যে কোন কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

জেনারেল জিয়া সামরিক শাসকের লেবাস থেকে রাজনৈতিক নেতার লেবাস পরার জন্য নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়ার প্রাক্কালে প্রচুর অনাকাঙ্ক্ষিত সন্ত্রাসীকে প্রলোভনের মাধ্যমে দলে নিতে চেয়েছিলেন এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। তিনি ছাত্র সংগঠন খোলার ক্ষেত্রেও একই পথ ধরেন। তিনি বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক সংগঠকদের তার দলে নেয়ার জন্য অর্থের প্রলোভন দেখিয়েছিলেন।

পরবর্তী কিস্তি ১২ এপ্রিল।

সৈয়দ কামরুল আহ্সান : প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

তারিখ ... 09 APR 1994 ...